ওতম্
যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
-ঃ লেখক ঃ-
ডক্টর আচার্য ব্রহ্মদত্ত আর্য (বেদমনীষী)

যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ

লেখক ঃ

ডক্টর আচার্য ব্রহ্মদত্ত আর্য (বেদমনীষী)

পি.এইচ.ডি., ডি.লিট্

বেদ-ব্যাকরণ-দর্শন-আয়ুর্বেদাচার্য

(লব্ধ স্বর্ণপদকদ্বয়)

গুরুকুল সংস্থাপক, সঞ্চালক এবং আচার্য

দূরভাষ ঃ ৮৯৭২০৯৩৮৫২

প্রকাশক ঃ

ডাঃ দুলাল সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

বেদ, দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ

প্রকাশকের ঠিকানা : যোগতীর্থ গুরুকুল আশ্রম,
আর্য্য সমাজ রাণীচক, গ্রাম- রাণীচক, পোঃ- বাহারগঞ্জ,
থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
মোঃ- ৯৮০০৩১১০৭৮

প্রকাশ তিথি : গুরুকুলের বার্ষিক উৎসব,
১৪ই মার্চ, ২০১৫

প্রাপ্তিস্থান : আর্য প্রতিনিধি সভা বেঙ্গল
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোল-৬

মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য গুরুকুল কোলাঘাট
গ্রাম-কাউরচণ্ডী, পোঃ- আমলহান্ডা,
কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, মোঃ- ৮৯৭২০৯৩৮৫২

মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য কন্যা গুরুকুল,
আবাদা স্টেশন পল্লী, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ
যোগতীর্থ গুরুকুল আশ্রম,
আর্য্য সমাজ রাণীচক,
গ্রাম- রাণীচক, পোঃ- বাহারগঞ্জ,
থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
মোঃ- ৯৮০০৩১১০৭৮

আশদতলা বেদ মন্দির,
গ্রাম- নরসিংহপুর, পোঃ- আশদতলা, থানা - নন্দীগ্রাম,
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর

কন্যা গুরুকুল লালুয়াগ্যাড়িয়া, গ্রাম - লালুয়াগ্যাড়িয়া,
থানা - ময়না, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রক : জয় মা কালী প্রেস, কলাগেছিয়া, মোঃ ৯৭৩২৮২৬৪২১

।।ও৺ম্।।

যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ

প্রশংসাপত্র এবং হৃদয়ের উদ্গার

আমি এই লঘু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়াছি যে- আর্য্য জগতের মূর্ধন্য বিদ্বান্, **'সংস্কৃত সেবাসম্মান পুরস্কার'** প্রাপ্ত বেদমনীষী আর্য্য শিক্ষা প্রণালীর সংবাহক, পূজ্যপাদ ডা. আচার্য ব্রহ্মদত্ত আর্য্য মহাশয় অদ্ভূত প্রতিভার ধনী। যেরূপ একটি ছোট দুরদর্শনের মাধ্যমে আমরা দেশদেশান্তরের খবর অবগত হইয়া থাকি সেইরূপে আচার্য্য মহাশয় এই লঘু পুস্তিকার মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন। আচার্য্য মহোদয়ের দ্বারা লিখিত **'যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ'** জনসাধারণকে এই সন্দেশ প্রদান করিতেছে যে - জীবনে অনুশাসন (নিয়ম শৃঙ্খলা) এর প্রয়োজন রহিয়াছে এবং অনুশাসন ব্যাতীরেকে যোগ কখনো সম্ভব নয়। বলা হইয়া থাকে যে -

हां! मेरे जीवन का प्रतिपल
बातो में ही बीती जाता
उलझन जटिल नवीन समाय।

কেবল একটাই প্রবল নিদান রহিয়াছে এবং সেই নিদান বা সমাধান হইল যোগ এবং যোগাভ্যাস।

মহর্ষি পতঞ্জলী যোগদর্শনে যোগের অদ্ভূত গুণগান করিয়াছেন। 'যোগ' বিশ্বে সকল সমস্যার এবং সকল রোগের একাই নিবারণ করিতে সক্ষম।

ইহা চিন্তনের বিষয় যে - বৃক্ষ কিসের দ্বারা রস সংগ্রহ করিয়া থাকে ? মূলের দ্বারা। এই জন্য বৃক্ষের মূলে অর্থাৎ পাদদেশে জল ঢালিতে হইবে। ঠিক এইরূপে মনুষ্যের মধ্যে শক্তি ভীতর (অভ্যন্তর) হইতে আসিয়া থাকে বাহির হইতে আসে না। অতএব অভ্যন্তরে ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু আজকাল সংসারে দেখিয়া থাকি যে - ব্যক্তিগণ বাহিরে সাজ সজ্জার লাগিয়া থাকে। বহির্পাশ ঠিক করিতে উদ্দ্যত হইতেছে কোথাও শরীরের আবার কোথাও গৃহের পরন্তু বাস্তবিকতা তো ইহাই হইতেছে যে - মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যার্সের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার ইত্যাদি কুবিচারকে দূরীভূত করা উচিত। পরাজিত করা উচিত। ইহাই যোগ, ইহাই সমাধি। পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় এই সকল মূল্যবান এবং মনুষ্যকে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছাইবার সারগর্মিত, অকাট্য উক্তির উল্লেখ **'যোগ মার্গের দিব্য সন্দেশ'** এর মধ্যে করিয়াছেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে - সকল ক্লেশ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান। অতএব মনুষ্যকে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার উপর পৌঁছাইতে হইবে। উত্তম গ্রন্থের স্বাধ্যায় করিতে হইবে এবং উত্তম কথামালা শ্রবণ করিতে হইবে।

সামবেদে আছে -

পন্যং পন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়।
সোমং বিরায় শুরায়।।

অর্থাৎ হে সোমের সম্পাদকগণ! বিদ্বানগণ! আপনারা হর্ষশীল, বিক্রমশীল, বীর্যবান পুরুষ বা রাজার জন্য উত্তমোত্তম সোম ঔষধি এবং আধ্যাত্মিক উপদেশরূপী সোম রস পান করাইতে থাকিবেন। বাস্তবে দুঃখ, যন্ত্রনার কালে যদি কোন রক্ষক থাকে তাহারা

হইলেন বৈদিক বিদ্বান্, উপদেশক, পুরোহিত এবং তাহাদের আধাত্মিক গ্রন্থ। আচার্য্য মহোদয় লিখিয়াছেন যে প্রত্যেক নরনারী ধর্মের যথাযোগ্য আচরণ করিবেন এবং অধর্ম হইতে বিরত থাকিবেন। এই জন্য দিবারাত্রি নিয়ত সময়ে যোগ, যোগাভ্যাস করিবেন কেন না যোগ বিনা বিজয়প্রাপ্ত হইতে পারে না। সফলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং আসুন যদি জীবনে বিজয়ী হইতে চাহেন তাহা হইলে পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয়ের এই বিশেষ লঘু পুস্তক খানি অধ্যয়ন করিবেন এবং অপরকেও অধ্যয়নের প্রেরনা প্রদান করিবেন এবং নিজ জীবনের, পুত্র-পুত্রীদিগের জীবনের, মাতা-পিতার জীবনের, স্বামী-স্ত্রীর জীবনের এবং অন্যান্য দিগের জীবনের কল্যাণ করিবেন। আশা করিব ইহা পাঠ করিয়া জনগণ অত্যন্ত লাভান্বিত হইবে এবং সকলেরই কল্যাণ হইবে। অবশেষে আমাদের সকলের নিকট হইতে আপনাদিগের প্রতি কোটি কোটি বন্দন, অভিনন্দন রইল।

শুভাকাংক্ষী

আচার্য্যা মীরা শাস্ত্রী

।।ওঁম্।।

ভূমিকা

সংসারে দুই প্রকারের মনুষ্য রহিয়াছে প্রথমতঃ দুঃখকে ভুলিতে চায়, দ্বিতীয়তঃ দুঃখকে নিঃশেষ করিতে চায়। আমাদের সম্মুখে যখন দুঃখ আসিয়া থাকে তখন আমরা টি.ভি. চালাইয়া দেখিতে থাকি, খবরের কাগজ পড়িতে থাকি, তাস খেলিতে যাই, জুয়া খেলিতে যাই, মদ্যপান করিতে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রিয়া করিয়া থাকি। কেন? কেন না আমরা দুঃখকে ভুলিতে চাই। ঋষি, মহর্ষি, যোগী, জ্ঞানী, ধ্যানী, তত্ত্বদর্শী মনীষিগণের সম্মুখে যখন দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে তখন তাঁহারা দুঃখকে ভুলিবার চেষ্টা করেন না। অপিতু দুঃখকে নিঃশেষ করিতে প্রচেষ্টা করেন। কেননা তাঁহারা জানেন যে দুঃখকে ভুলিয়া গেলে দুঃখ সমাপ্ত হয় না, অপিতু দুঃখকে নিঃশেষ করিতে পারিলে দুঃখের সমাপ্তি হইয়া যায়। একটি ঘরের মধ্যে ইঁদুর মরিয়া পড়িয়া থাকিবার ফলে ঘরের মধ্যে দুর্গন্ধ ভরিয়া যায়। বাড়ির অভিভাবক পিতা বলিলেন - পুত্র! যজ্ঞ কর, দুর্গন্ধ নাশ হইয়া যাইবে। পুত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিল ঘি এবং সামগ্রীর আহুতি দিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞের সুগন্ধির দ্বারা মৃত ইঁদুরের দুর্গন্ধ নাগাল পাইল না, চাপা থাকিল, কিন্তু যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে আবার সেই দুর্গন্ধ আসিতে থাকিল। দুর্গন্ধ এড়াইবার জন্য যজ্ঞ সাময়িক, তাৎকালিক কারণ ছিল, স্থায়ী রূপে কারণ ছিল না। পিতা পুনঃ বলিলেন, পুত্র! মৃত ইঁদুরকে খুঁজিয়া বাহির কর এবং বাহিরে ফেলিয়া দাও। পুত্র টর্চ লাইট লইয়া ইঁদুরকে খুঁজিল - চাউল বস্তার নীচে ইঁদুর মরিয়া পড়িয়াছিল। সে ইঁদুরটিকে লাঠির দ্বারা উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। **"কারণাভাবাৎ কার্য অভাবঃ"**। কারণ রূপ মৃত ইঁদুরকে সরাইবার ফলে কার্যরূপ দুর্গন্ধ

ও সরিয়া গেল। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে - দুঃখকে অপসারিত করিবার স্থায়ী উপায় কি? যাহা গ্রহণ করিয়া আমরা সদা সর্বক্ষণের জন্য দুঃখকে বিলীন করিয়া দিতে পারি। উত্তর হইল যোগাভ্যাস। যোগাভ্যাসই এমন একটি সুনিশ্চিত উপায় যাহা গ্রহণ করিয়া মনুষ্য প্রকৃতি পুরুষরূপী অবিবেককে উচ্ছেদ করিতে পারে। কপিলাচার্য বলেন যে - "**নিয়ত কারণও দুচ্ছিত্তি র্ধ্বান্তবৎ।**" নিয়ত কারণ-বিবেকের দ্বারা ঐ অবিবেকের উচ্ছেদ বা নাশ হইয়া থাকে। আলোকের উপস্থিতিতে অন্ধকারের নাশ হয় যেরূপে তাহারই সমান।

আসুন, আমরা যোগাভ্যাস যোগ সাধনার দ্বারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সচিদানন্দ, পরমাত্মার নিত্য সুখ অনুভব করি। যোগ মার্গের দিব্য সন্দেশ এর ইহাই হইল দিব্য সন্দেশ।

ইত্যোম্

বিদুষামনুচরঃ

- লেখক

।।ওম্।।

যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ

প্রস্তাবনা

ঈশ্বরীয় সৃষ্টির মধ্যে মানবদিগের জন্য যদি কোন সর্বোত্তম উপহার হইয়া থাকে তাহা হইল **বেদ**। কেননা বেদের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস প্রাপ্ত হয়। মানব জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানাত্মক সূত্র বেদের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে জীবন এবং জগতের অনুপম ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠার বর্ণন রহিয়াছে। বেদের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, উপাসনার অদ্ভুত সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাভ্যাসীগণের জন্য তো '**বেদ**' হইল যোগবিদ্যার কোষ, আচার্য ও গুরু। এইজন্য মহর্ষি, যোগী, ধ্যানী, সাধু, সন্ত গণ ঐহিক এবং আমুষ্মিক (পরলৌকিক) কল্যাণ হেতু যোগকে সর্বোপরি স্থান দিয়া আসিতেছেন। এই যোগবিদ্যার কারণেই ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা নির্বিবাদ সত্য যে যোগই মোক্ষ প্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায়। এই জন্য প্রাচীন অর্বাচীন সকল গ্রন্থে যোগের চর্চা কোন না কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেও যোগকে কোন না কোন রূপে মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। আজকাল যোগের নামে নানা প্রকারের ভ্রান্তি ছড়ানো হইতেছে, তথা যোগের নামে অবৈদিক যোগ শেখানো হইতেছে, অথবা যোগাসনকেই সর্বোপরি যোগের তাৎপর্য মান্য করা হইতেছে। ইহার দ্বারা সমাজ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যোগের মুখ্য তাৎপর্য মুক্তির প্রাপ্তি তথা পরমানন্দের প্রাপ্তি হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে। এই জন্য যোগের বাস্তবিক স্বরূপের বোধ করা পরমাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

যোগ মার্গের বিবেচনা

সুখ এবং দুঃখের দ্বন্দ্ব অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্য দুঃখকে ত্যাগ করিতে তথা সুখকে গ্রহণ করিতে চায়। ইন্দ্রিয় বিষয়গুলির সেবন মনুষ্যকে সুখ দিয়া থাকে "**অনুকূল বেদনীয়াত্মকং সুখম্**" ইন্দ্রিয় গুলির জন্য যাহা অনুকূল তাহাই সুখ। ইন্দ্রিয়গুলির জন্য যাহা প্রতিকূল তাহাই দুঃখ অর্থাৎ "**প্রতিকূল বেদনীয়াত্মকং দুঃখম্**"। মনুষ্য সুখ প্রাপ্ত করিবার জন্য অত্যাধিক সাধনের উপায় সংগ্রহ করিয়া যাইতেছে। আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পদক্ষেপের দ্বারা মনুষ্য গগনচুম্বী অট্টালিকার স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিকে বৈজ্ঞানিক অবিষ্কার মনুষ্যকে সুখী, আরামপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এত সকল হইয়াও আজকের মানব বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, অধঃপতিত হইয়াছে, সন্ত্রস্ত, দুঃখী, খিন্ন, নিরাশ, কুণ্ঠিত হইয়াছে কেন? কারণ স্পষ্ট এই যে ভৌতিক সুবিধাগুলি ব্যক্তিকে আরামপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু শান্তির মার্গ দেখাইতে অসমর্থ হয়। শান্তির মার্গ তো কেবল যোগমার্গই হইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে যে 'যোগমার্গ' কী? ব্যক্তি স্বয়ং নিজেকে জানিবে এবং নিজের মধ্যে নিজে রমণ করিতে থাকিবে। ইহাই যোগমার্গ। বহু সমস্যাও রোগ সন্তপ্ত লোকজীবন কে প্রাণ প্রদানকারী তত্ত্বই হইল যোগ জীবন। আত্মনিষ্ঠ চৈতন্যের জাগরণই যোগ। জাগৃত আত্মানুভূতির নামই তো যোগ। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, লাভ-অলাভ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবার মার্গই হইতেছে যোগ মার্গ। যোগ মার্গের সম্বন্ধ কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত রহিয়াছে, চিত্তের নির্মলতার সহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক, ভৌতিক এবং আর্থিক প্রগতি যতই হোক না কেন যোগমার্গের অভাবে আত্মিক আনন্দ অসম্ভব হইবে। যোগ

শিখোপনিষদের প্রথমোধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে -

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো ঽপি ধর্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

বিনা দেহেঽপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে বিধে।।"

হে বিধে! সাধক যদিও জ্ঞান নিষ্ঠ, বিরাগী, ধর্মজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় হয়, তথাপি 'যোগসাধন ' ব্যতিরেকে এই দেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

একজন পদার্থ বৈজ্ঞানিক গৃহ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ঘোর পুরুষার্থ করিয়া সফলতা প্রাপ্ত করিয়া এবং পনেরো বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া ছোট পুত্রকে দেখিয়া প্রসন্নতা পূর্বক বলিলেন যে - পুত্র! আমি পনেরো বৎসর ধরিয়া যে কার্যের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম উহাতে অনেক সফলতা প্রাপ্ত করিয়াছি। আমি মনে করিলে এক মিনিটে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করিতে পারি, কেননা আমি হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের কলাকৌশল শিখিয়াছি। পিতার উক্তি শুনিয়া পুত্র হাস্য করিল এবং বলিল পিতা! সর্বপ্রথম আমাকে ধ্বংস করিয়া দেখান পরে আপনি পৃথিবীকে ধ্বংস করিবেন বা শেষ করিবেন? পুত্রের বাক্য শুনিয়া পদার্থ বৈজ্ঞানিক মাথা ঝুকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কিসের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম? আমি তো সুখ, শান্তি এবং অমৃতের অন্বেষণে, জীবনে সুখের অনুসন্ধানের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অমৃত হস্ত গত হয় নাই, জীবন হস্ত গত হয় নাই আমি তো মৃত্যুকে আবিষ্কার করিয়াছি। জীবনের নিকটে আমি যাইতে পারি নাই। বাস্তবে আমরা সকলে এই অনাদিকাল হইতে চলায়মান সৃষ্টির মধ্যে জীবনে সুখের অনুসন্ধানের জন্য অমৃতত্বের সন্ধানের জন্য রওনা হইয়াছি, কিন্তু

জীবন এবং অমৃতত্ব আমাদের হস্তগত হইতেছে না, আমরা মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছি। বাস্তবে জীবনের আবিষ্কার, অমৃতের আবিষ্কার যোগসাধনার দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে। বেদের মধ্যে এরূপ মন্ত্র আসিয়াছে

"ওঙ্ম্ অন্তস্তে দ্যাবাপৃথিবী দধাম্যন্তর্দধাম্যুর্বন্তরিক্ষম্।
সজূর্দেবেভিরবরৈঃ পরৈশ্চান্তর্যামে মঘবন্ মাদয়স্ব।।" যজু ৭/৫

যোগের নিয়ম পালনকারী দিগকে প্রভু বলিতেছেন আমি তোমার ভিতরে মস্তিষ্করূপে দ্যুলোক, শরীর রূপে পৃথিবী লোক এবং হৃদয়রূপে অন্তরিক্ষ লোককে ধারণ করিয়া আছি। দেবতাগণের সহিত মিত্রতাকারী তো যোগের দ্বারা মনের ভিতরেই জ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যে অধিকারী হইয়া আনন্দের অনুভব করিতে পারেন, যেরূপ ইক্ষু হইতে রস বাহির করিলে, বস্ত্র হইতে সূত্র বাহির করিলে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত বাহির করিলে যেরূপ সেই সকল পদার্থের সার তত্ত্ব নিষ্কাশনের ফলে ইহারা তেজ হীন হইয়া যায়, ঠিক সেই রূপেই মানব জীবন সাধনা রহিত হইয়া গেলে মানবজীবন মহত্ত্বহীন হইয়া যায়, এই জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষগণ, ঋষি, মহর্ষিগণ সাধনার দ্বারা 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞার প্রপ্তি করিয়াছিলেন। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারা সৎ-অসৎ, সত্য-অসত্য, ধর্ম-অধর্ম, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের অবলোকন করিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধির নিরূপণ করিয়াছিলেন। নীতিকার অতি উত্তম একটি শ্লোক লিখিয়াছেন -

"নীতিজ্ঞা নিয়তিজ্ঞা বেদজ্ঞা অপি ভবন্তি শাস্ত্রজ্ঞাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞা অপি লভ্যা স্বজ্ঞান জ্ঞানিনো বিরলাঃ।"

অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের পন্ডিত, জ্যোতিষী, চতুর্বেদী, শাস্ত্রী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী বহু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নিজ অজ্ঞান, নিজ অপূর্ণতা এবং অসমর্থতাকে জানিয়া বুঝিয়াই নিজেকে সংস্কারিত জ্ঞানগুণের দ্বারা সম্বদ্ধিত তথা আত্মশক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ শালী করা যাইতে পারে।

আপনি দেখিয়া থাকিবেন যে, পাহাড়ের উপর বর্ষা হইলে জল নিচে আসিয়া ছোট বড় গর্তে ভরিয়া যায়। তারপর জল ঝর্ণার রূপ ধারণ করিয়া একটি দিকে চলিতে থাকে, সম্মুখে যদি টিলা, পাহাড় ইত্যাদি অবরোধক তত্ত্ব আসিয়া যায় তাহা ইহলে ঝরনার জল স্থান বদল করিয়া রাস্তা নির্মাণ করিয়া সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়। ঠিক ঐভাবে মনুষ্য জীবনে যখন ঈশ্বর কৃপার বৃষ্টি হইয়া থাকে তখন মনুষ্য জীবনের নিজ লক্ষ্যকে নির্ধারিত করিয়া লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য শত বিঘ্ন, বাধা সহ্য করিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং লক্ষ্য প্রাপ্তি করিয়াই ক্ষান্ত হয়।

সংসারে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য সমস্ত দুঃখ, বন্ধন এবং পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চায় এবং নিত্যানন্দ, মোক্ষ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত করিতে চায়, বিশুদ্ধ যোগের দ্বারা এই দুই প্রকারের প্রয়োজন বিশুদ্ধ যোগ দ্বারাই সম্ভব হইবে। ইহাকে সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন উপায় নাই।

যোগ মার্গে যাত্রা

বৈদিক মনীষিগণ বলিয়াছেন **'নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমং বলম্।'** অর্থাৎ 'সাংখ্যের' সমান কোন জ্ঞান নাই এবং 'যোগের' সমান কোন বলও নাই। যোগ হইতেছে 'সাংখ্যেরই ক্রিয়াত্মক রূপ'। **যোগ মত মতান্তর তথা সম্প্রদায় হইতে মুক্ত।** যোগ বাদবিবাদ তথা পক্ষপাত রহিত, **'সার্বভৌম'** ধর্ম যাহা তত্ত্বের জ্ঞান স্বয়ং অনুভব করা শেখায় এবং মনুষ্যকে তাহার ধ্যেয় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে। সকল শ্রুতি-স্মৃতি যোগের মহিমাগান করিতেছে। যোগ দর্শনকার যোগের বাস্তবিক স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। **"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"** যোগ০১/২। চিত্তের বৃত্তি সকলকে রোধ করাই হইল যোগ। স্থূলতা হইতে সূক্ষ্মতার অভিমুখে যাইবার নামই যোগ। অর্থাৎ বাহির হইতে অন্তর্মুখী হওয়া। চিত্তের বৃত্তি সকলের দ্বারা আমরা স্থূলতার অভিমুখে যাত্রা করিয়াথাকি। বহির্জগতে বিচরণ করিতে থাকি। বৃত্তিগুলি যতই বহির্মুখ হইয়া যাইবে, ততই তাহাদের মধ্যে রজোগুণ এবং তমোগুণের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া যাইবে এবং উহার বিপরীত যতই বৃত্তিগুলি অন্তর্মুখী হইয়া যাইবে অর্থাৎ অন্তর্যাত্রা করিবে ততই রজোগুণ এবং তমোগুণ তিরোভাব হইয়া যাইবে। সত্ত্বঃগুণের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া তখন পরমাত্মার শুদ্ধ স্বরূপের মধ্যে জীবাত্মার অবস্থান হইয়া যায়। দর্শনকার বলিয়া থাকেন - **'তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপে ऽবস্থানম্।।'** যোগ. ১/৩। চিত্তের বৃত্তি সকলের নিরোধ হইলে জীবাত্মা নিজ স্বরূপের সহিত পরমাত্মার স্বরূপেও অবস্থান করিতে থাকে। যজুর্বেদে **যোগ** বিদ্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসুদের জন্য উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে যে - যোগাভ্যাসীগণ যম-নিয়ম ইত্যাদি যোগের অঙ্গ সকলের মাধ্যমে চিত্ত আদি অন্তঃকরণের বৃত্তি সকলের রোধ

করিয়া অবিদ্যাদি দোষগুলির নিবারণ করিয়া ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অবগত হয় যে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় যোগ। যোগের অপর নাম সমাধি। "যোগঃ সমাধিঃ"। (ব্যাসভাষ্য)। 'সমাধানং সমাধিঃ।' মনুষ্য যে স্থিতিতে পৌঁছাইয়া ব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক রোগ তথা আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ, এই দুই প্রকারের রোগের সমাধান করিতে সক্ষম হয় সেই স্থিতিকে সমাধি বলা হয়। 'সমাধীয়তে চিত্তমনেন ইতি সমাধিঃ।' জন্ম জন্মান্তরের প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ অবিবেক জনিত হইয়া রহিয়াছে। যোগ সাধনা ব্যতীত অবিবেক হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। যোগের অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিলে অশুদ্ধির নাশ হইয়া জ্ঞানালোক উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত উপনীত হওয়া যায়। বিবেক খ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি তথা পুরুষের ভেদ জ্ঞান হওয়া মান্য হয়। অথর্ব বেদে সাধক গণের জন্য ক্রমিক উন্নতির একটি খুব সুন্দর মন্ত্র পাওয়া যায় -

ওম্ পৃষ্ঠাৎপৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষ মারুহমন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্।

দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্।' অথর্ব০ ৪/১৪-৩

অর্থাৎ আমি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উপরে উঠিয়া অন্তরিক্ষে আরোহণ করিয়াছি। অন্তরিক্ষ হইতে দৌলোকে আরূঢ় হইয়াছি। দুঃখ রহিত দ্যৌলোকের পৃষ্ঠ হইতে আমি আনন্দময় প্রকাশকে প্রাপ্ত হইয়াছি। সাধক যোগাভ্যাসের দ্বারা উচ্চতম স্থিতি প্রাপ্ত করিতে পারে, এই মন্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে। জীবনের সফলতার তিনটি সূত্র মান্য হয়। (১) একাগ্রতার বিকাশ করা (২) চিত্ত মনের পবিত্রতার মধ্যে জাগ্রত থাকা। (৩) অজ্ঞানতার হ্রাস করা। বাস্তবে আজকাল অজ্ঞানতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে মনুষ্য যোগের মহত্ত্বকেও বুঝিতে

পারিতেছে না - ইহা প্রথম সংকট। দ্বিতীয় সংকট হইল যে, মনুষ্যের মনের মধ্যে এত মলিনতা ভরিয়া আছে যে, সে মনোযোগের সহিত তাহার চিন্তাধারার সঠিক মূল্যাঙ্কন করিতে পারিতেছে না। তৃতীয় সংকট এই হইল যে - মন একাগ্র হইতে পারিতেছে না, চঞ্চলতা থামিতেছে না। উপরোক্ত তিনটি আবশ্যকতা পূর্ণ করিতে হইলে এই তিনটি সংকটকে মোচন করিতে হইবে অথবা সংকটের সমাধান করিতে হইবে। আমরা যদি যোগ দর্শনের দিকে দৃষ্টি দিই তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে উপরোক্ত তিনটি সমস্যার সমাধান করিতে পারিব এবং সফলতার শিখরে অবশ্যই সফল হইতে পারিব। অজ্ঞানতাকে আপনারা দার্শনিক ভাষাতে মিথ্যাজ্ঞান, দুষ্টজ্ঞান, অবিদ্যা, বিপরীত জ্ঞানের নামেও জানিতে বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে - "**অবিদ্যা নেত্রীমূলং সর্বক্লেশানাম্।**" যে সমস্ত ক্লেশ, কষ্ট, বাধা রহিয়াছে তাহাদের নেত্রী হইতেছে অবিদ্যা, মিথ্যা জ্ঞান। এই জন্য অবিদ্যার স্বরূপের জ্ঞান হওয়া খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থপ্রকাশের নবম সমুল্লাসে বিদ্যা অবিদ্যা, বন্ধন-মোক্ষের বিষয়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।" যজু. ৪০/মন্ত্র-১৪

যে মনুষ্য বিদ্যা এবং অবিদ্যার স্বরূপকে সাথে সাথে নির্ধারণ করিতে পারে সে অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মোপাসনার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সহিত মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন - '**অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।**' যোগ০ ২/৫ (অনিত্য-অশুচি-দুঃখ

অনাত্মসু) অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখ এবং অনাত্মার মধ্যে ক্রমশঃ (নিত্য-শুচি-সুখ-আত্মখ্যাতি) নিত্য, পবিত্র, সুখ এবং আত্মা ইহাদের উপস্থিতি জ্ঞান হওয়াই (অবিদ্যা) মিথ্যা জ্ঞান।

অজ্ঞান অথবা মিথ্যা জ্ঞানকে আমরা কিভাবে সমাপ্ত করিব? উত্তর - প্রাণায়ামের দ্বারা। নিরন্তর প্রাণায়াম করিতে থাকিলে "**ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।।**" (যোগ. ২/৫২)। অর্থাৎ নিরন্তর প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবার ফলস্বরূপ আত্ম-পরমাত্মার ভ্রমের আবরণ যাহা অবিদ্যা তাহা নিত্য প্রতিক্ষণে নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানের প্রকাশ বিকশিত হইতে থাকে। মনুস্মৃতির মধ্যে লিখিত রহিয়াছে :- "**প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্**" অর্থাৎ নিত্য প্রতি প্রাণায়ামের দ্বারা আত্মার অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় সকলের দোষ ভস্মীভূত করুন। এখন মনের মলিনতা আমরা কেমন করিয়া দূর করিব? যদ্যপি প্রাণায়ামের দ্বারা মন, ইন্দ্রিয়াদির মল নষ্ট হইয়া যায়, পুনরপি 'ওম্' এর জপ অর্থ-চিন্তন পূর্বক করিতে থাকিলে মনের মলিনতার নাশ হইয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন - "**ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমো Sপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।।**" যোগ. ১/২৯

সূত্রার্থ - **ঈশ্বর প্রণিধানের** দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার, জীবাত্মার সাক্ষাৎকার এবং সকল বাধা বিঘ্নের অভাব = বিনাশ হইয়া যায়। পুনঃপ্রশ্ন হইবে যে একাগ্রতা ধরিয়া রাখিবার উপায় কী? '**দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা**' (যোগ. ৩/১)। কোন স্থান বিশেষের উপর চিত্তকে স্থির করাকেই **ধারণা** বলা হয়। ঐ ধারণা বিশিষ্ট স্থানে চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুর সংলগ্নে ধরিয়া রাখিবার জ্ঞানের প্রবাহকে **ধ্যান** বলা হয়। এই ভাবে আমরা দেখিয়া থাকি জীবনের সফলতার জন্য যে সকল বাধক তত্ত্ব অজ্ঞানতা, চিত্তের মলিনতা তথা একাগ্রতার অভাব - এই সবই সকল হিন্দুদিগের যোগমার্গের যাত্রাপথে স্বয়ং

সমাধান হইয়া যায়। তখন ব্যক্তি সফলতার চূড়ান্ত শিখরে অবশ্যই পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। আমরা প্রায় দেখিয়া থাকি ছোট ছোট শিশুরা ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ির সূতা যখন নিজের দিকে টানে তখন ঘুড়ি আরও উর্ধ্বমুখী হয়। কি সূতা যখন শিথিল করা হয় তখন ঘুড়ি তৎক্ষণাৎ নিচে পড়িয়া যায়। ঐরূপ মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমরূপী সূতার দ্বারা টানিয়া রাখে, তখন জীবন রূপী ঘুড়ি উপরে উড়িতে থাকে এবং সংযম রূপী সূতা কে অবহেলা করিলে তাহা নিম্নে অবশ্যই পতিত হইবে। যোগ মার্গে প্রগতি করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ করা পরমাবশ্যক কেননা সম্পূর্ণ সফলতা জিতেন্দ্রিয়ত্বের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বেদের বাণী -

'ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃ ষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি। য়ৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ।' অথর্ব০ ১৯/৮/৫

অর্থ - এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠম মন কে আমার হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্ম স্থাপিত করিয়াদিয়াছেন, ইহাদের অপব্যবহারের ফলে মনুষ্য ভয়ঙ্কর দুঃখ প্রাপ্ত করিয়া থাকে। ইহাদের সদ্ ব্যবহারের দ্বারা মনুষ্য শান্তি প্রাপ্ত করিয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য কুমার সম্ভবের মধ্যে বলিয়াছেন, - **'বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে য়েষাং ন চৈতাংসি ত এব ধীরাঃ।'** অর্থাৎ মনের মধ্যে বিকার উৎপন্ন ইহবার কারণ- সাধন উপস্থিত হইলেও যাহার মন বা চিত্ত বিকৃত হয় নাই, তিনিই ধীর পুরুষ, তিনিই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। অষ্টবক্র গীতার মধ্যে লিখিত হইয়াছে -

**"মোক্ষো বিষয়বৈরস্য বন্ধো বৈষয়িকোরসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু।।"**

অর্থাৎ বিষয়ের মধ্য হইতে ভোগ লালসা নির্মূল হওয়াতেই মোক্ষ লাভ হয় এবং বিষয়ের প্রতি ভোগ লালসার কামনা থাকিলে বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বিজ্ঞান এই পর্যন্ত আসিতে পারে। আপনার যাহাই ইচ্ছা হইবে তাহাই করিবেন। এই সংসারে বিষয়রূপী বিষ হইতে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক। কেননা এই বিষয় বস্তুতঃ বিষ অপেক্ষা অতি ভয়ঙ্কর। বিষ সেবন করিলে মৃত্যু হয়। অথবা কোন প্রকারের বিকৃতির অনুভব হয় কিন্তু ভোগ বিষয়ের কেবল মননই পতনের জন্য পর্যাপ্ত কারণ হইয়া থাকে। অস্তু -

কোন এক সময় হিমালয়ের উপত্যকায় অনেক তপস্বী একত্রিত হইয়াছিলেন। চিন্তনের বিষয় ছিল রোগ। তাঁহাদের বিচার্য বিষয় ছিল যে মিতাহারী ব্রহ্মচারী এবং তপস্বী গণও রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন। ইহাই চিন্তনীয়, ইহার সমাধান হওয়া উচিৎ। সকলে সহমতি লইয়া ঋষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট পৌছাইলেন এবং উক্ত প্রশ্নের সমাধান চাহিলেন। ইন্দ্র তথ্য চতুষ্টয়ীর নিরূপণ করিয়া সমাধান প্রদান করিলেন। (১) রোগ (২) রোগ হেতু (৩) আরোগ্য (৪) আরোগ্য হেতু। ইহা হইতেছে আয়ুর্বেদের চতুষ্টয়ী। এই সকলকে না জানিয়া কোন বৈদ্য রোগের নিরাময় করিতে পারিবে না। এই রূপ দর্শনের ক্ষেত্রেও চতুষ্টয়ীর বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) হেয় (২) হেয় হেতু (৩) হান এবং (৪) হানোপায়। এই সকলকে না জানিয়া কোন ব্যক্তি ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কৈবল্যপদকে প্রাপ্ত করিতে পারেন না। এই জন্য ইহার স্বরূপের বোধ হওয়া অনিবার্য। দুঃখকে বলা হয় হেয়, হেয় হেতু হইতেছ দুঃখের কারণ। সুখ কে বলা হয় হান, হানোপায় হইতেছে সুখের কারণ। এই চারটি বিষয়ের পরিজ্ঞান এবং ইহার জন্য আবশ্যক কর্তব্যের পালন করিয়া অনাগত দুঃখকে

দূর করা যাইতে পারে, কেননা যে দুঃখ আমরা ভোগ করিয়াছি, তাহাতো ভোগ করা হইয়াছে। তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা হইবে এবং যে দুঃখ আমরা ভোগ করিতেছি তাহার নিদান করিতে করিতে সেই দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এই জন্য যে দুঃখ আসিবে তাহার প্রতিকারের জন্য আমাদিগের চেষ্টা করা উচিত। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন '**হেয়ং দুঃখমনাগতম্।**' (যোগ০ ২/১৬) অর্থাৎ অনাগত দুঃখের প্রতিকার করা উচিৎ। প্রত্যেক মনুষ্য মন, বাণী এবং শরীরের দ্বারা তিন প্রকার কর্ম করিয়া থাকেন। ক্রিয়া করিবার পূর্বে পরীক্ষা করা উচিত যে এই ক্রিয়ার পরিণাম প্রভাব ফল কী হইবে? যদি পরিণামে সুখ দেখা দেয় তাহা হইলে উহা করা উচিত এবং পরিণামে দুঃখ দেখা দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। কেননা প্রায়ই মনুষ্য ক্রিয়ার পরিণামকে না জানিয়াই ক্রিয়া করিতে তৎপর হইয়া পড়েন এবং দুঃখদ পরিণাম হইলে পরে পশ্চাৎতাপ করিয়া থাকেন। হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায় ইহাদের আলোচনা চলিতেছিল। যদি আমি বলিতে পারি যে হেয় অর্থাৎ দুঃখ হইতেছে মানব শরীর। কেননা

'বিবিধবাধনায়োগাৎ দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ।' ন্যায়০ ৪/১/৫৫

বিবিধ বাধা হইতে, পীড়া হইতে, দুঃখ হইতে মানব বারংবার বাধিত হইয়া থাকে এই জন্য জন্মধারণ করাই দুঃখ। হেয়হেতু = সৃষ্টি, অবিদ্যাজনিত কর্মাশয়। হান = সুখ অর্থাৎ পরমাত্মার নিত্য সুখ। ঐ নিত্য সুখকে প্রাপ্ত করিবার জন্য উপায় হইতেছে হানোপায় অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা যোগাভ্যাস ব্যতীত পরমাত্মার আনন্দ জীবাত্মা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না। বেদান্ত দর্শনে লিখিত হইয়াছে 'আনন্দময়ো ऽভ্যাসাৎ'। অর্থাৎ আনন্দময় ঈশ্বরের

উপাসনা করিয়া জীবাত্মা আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। বেদে অতি সুন্দর মন্ত্র রহিয়াছে -

'যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ।।' ঋগ্বেদ ৮/৪৪/২৩

হে আমার অগ্রনায়ক সর্বজ্ঞ পরমাত্মন্! যদি আমি তোমাতে হইয়া যাই এবং তুমিও আমাতে হইয়া যাও, তখন তোমার আশীর্বাদ এই জীবনে সত্য হইয়া যাইবে। বাস্তবে পরমাত্মার আশীর্বাদ তো তিনিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যিনি আসুরী সম্প্রদায় হইতে দূরে অবস্থান করেন। যিনি নিজ জীবন হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করেন, দুর্গুণ, দুর্ব্যসন সকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া দৈবীয় জীবনে আশ্রিত হইয়া সৎকর্ম করিয়া থাকেন। এমন কিছু লোক রহিয়াছেন যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিলেও দুর্গুণ, দুর্ব্যসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন এরূপ ব্যক্তিদিগের জন্য পরমাত্মার কোন কৃপা কদাচিৎ প্রতিফলিত হয় না। একসময় এক কৃষক ইক্ষুক্ষেতে জল সিঞ্চনের পর যাইয়া দেখিল - ক্ষেতের মধ্যে কিছু গর্তছিল সেই গর্তের মাধ্যমে সমস্ত জল অন্যত্র বাহিত হইয়াছে। এই জন্য আখের ক্ষেতটি শুকনো অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই রূপে যদি মনুষ্য বিষয় বাসনা, কাম, ক্রোধ, দুর্গুণ, দুর্ব্যসন ইত্যাদি জীবনে ধরিয়া রাখিয়া ঈশ্বরের ভক্তি, উপাসনা করিতে থাকে, সে যদি আজীবন ও নিয়মিত রূপে এই ভাবে সাধনা করিতে থাকে তাহা হইলেও অন্তিম কালে ইহাই দেখিয়া থাকে যে তাহার সকল সাধনা বাসনা রূপী গর্ত হইতে বাহিরে চয়িা গিয়াছে এবং সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছে। সে যৎসামান্যও প্রগতি করিতে পারে নাই।

বাস্তবে সংসারে অবস্থানকালে শুধু উত্তম কর্ম করিতে থাকা আবশ্যকই নয়, অপিতু অনিবার্য্যও বটে। সৃষ্টি চক্রের মধ্যে জীবন যাত্রার লক্ষ্য স্পষ্টতঃ মাত্র শারীরিক ভোগ নয় অথচ আত্ম সাক্ষাৎকার এবং দিব্যানুভূতি হওয়া উচিত। দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিলে সংসার দুঃখময় না হইয়া সুখময় হইয়া যায়। কথিত হইয়াছে

"রম্যেয়ং দেহনগরী রাম সর্বগুণান্বিতা।
অজ্ঞস্য-ইয়মনন্তানাং দুঃখানাং কোশমালিকা।
জ্ঞস্য তু ইয়মনন্তানাং সুখানাং কোশমালিকা।।" (যোগবাসিষ্ঠ)

অর্থাৎ মনুষ্য দেহ হইতেছে একটি সুন্দর নগরী, যাহা সর্বৈভবপূর্ণ। মূর্খজন অজ্ঞানতার কারণে ইহাকে দুঃখের তথা বিবেকীজন জ্ঞান এবং সাধণা দ্বারা সুখের স্থান হিসাবে নির্মাণ করেন। সংসারে প্রায়ই এমনটাই হইয়া থাকে যে, ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বল্প জ্ঞানের জন্যই প্রকৃত সুখের উপায়গুলিকে দুঃখের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকে তথা প্রকৃত দুঃখের কারণগুলিকে অথবা উপায়গুলিকে সুখের উপায় মান্য করিয়া থাকে, এই জন্য ব্যক্তিগণ বাস্তবিক সুখকে প্রাপ্ত করিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট হইবে যে, ব্যক্তি কী ভাবে দুঃখের উপায় গ্রহণ করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি মরুভূমি যাত্রার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে বাহির হইল, অন্ধের সাহারা হইতেছে লাঠি। লাঠির সাহায্যে সে যাত্রা করিতেছিল। যাত্রাপথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। ঐ প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি কোথায় যাইতেছেন? অন্ধজন বলিল যে, আমি মরুভূমি যাত্রায় বাহির হইয়াছি। প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যক্তি বলিল যে খুবই উত্তম যে, আমরা দুইজন একই স্থানে যাইতেছি। দুইজনে কিছুদিন

যাত্রা করিয়া মরুভূমিতে পৌঁছাইল। শীতের সময় ছিল, রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে হইবে। দুইজনে কম্বল বিছাইয়া মরুভূমিতে শয়ন করিল। প্রচন্ড ঠান্ডা পড়িয়াছিল। মরুভূমিতে বড় বড় বিষধর সর্প থাকে। একটি সর্প অন্ধব্যক্তির কম্বলের নিকট শুইয়া থাকিল। রাত্রিকালে যতই ঠান্ডা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ঘুমন্ত সর্প অতি ঠান্ডার কারণে লাঠির মতোই হইয়া পড়িয়া থাকিল, প্রাতকাল পাঁচটার সময় অন্ধব্যক্তি উঠিয়া যখন লাঠির জন্য হস্ত সম্প্রসারণ করিল, লাঠির রূপে সাপকে খুঁজিয়া পাইল। সে যখন সম্পূর্ণ লাঠির গায়ে হাত বুলাইল তখন বুঝিল যে, সে একটি খুব সুন্দর মসৃন লাঠি পাইয়াছে, পরমাত্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সে তাহার মিত্রকে লাঠির দ্বারা জাগাইল এবং বলিল যে মিত্র, শীঘ্র আমাদিগকে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, সামনে অগ্রসর হইতে হইবে। ঐ ব্যক্তি দেখিল যে, সত্যিই এই অন্ধ ব্যক্তিটি সাপের লাঠি লইয়া তাহাকে জাগাইতেছে। ঐ ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল যে মিত্র ইহা লাঠি নয় হইা তো বিষধর সর্প, ইহাকে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এটা তো আপনাকে দংশন করিবে। কিন্তু অন্ধব্যক্তি বলিল আপনি আমার নিকট হইতে এই সুন্দর লাঠিটিকে ছিনিয়া লইতে চাহেন। আপনি আমার মিত্র হইতে পারেন না, এই সকল বলিয়া অন্ধব্যক্তি সর্পদন্ড লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল। ঐ ব্যক্তি অন্ধব্যক্তিকে সর্পদন্ড ছাড়িয়া দিতে যথা সম্ভব বুঝাইল, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

বাস্তবে বিনাশ কাল যখন কোন ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন সে কোন ব্যক্তির উপদেশ শুনিতে চায় না। '**বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধিঃ**।' সেই অন্ধ ব্যক্তি সাপের লাঠি লইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর লাঠি লইয়া সামনে অগ্রসর হইতেছিল। যাহাকে সে সাহারা ভাবিয়া

ছিল সেই তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। আমরাও ঐ অন্ধ ব্যক্তির সমান মৃত্যুর সাধন সকলকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রায় চলিতেছি। ছল, কপটতা, হিংসা, আলস্য, চুরি, মিথ্যা ভাষণ, অন্যায়, ব্যভিচার, পাপাচার ইত্যাদি সকলই কি মৃত্যুর লাঠি নয়? যাহাদের ভরসায় আমরা জীবন যাত্রা করিতেছি তাহারাই হইতেছে আমাদের দুঃখের কারণ, মৃত্যুর কারণ। আজকাল অধিকাংশ লোক ইহারই সাহায্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। অস্তু

সেই অন্ধ ব্যক্তি সাপের লাঠি ধরিয়া চলিতেছিল। এদিকে সূর্য দেবতা উদয় হইয়া কিরণ বিস্তার করিতে ছিলেন। সূর্যের তেজস্বী কিরণের প্রভাবে সাপের মধ্যে তেজস্বিতা জাগিল, সাপের শিথিলতা নিবৃত্তি হইল এবং সাপটি অন্ধ ব্যক্তির হাতে দংশন করিল, সর্বক্ষণের জন্য তাহাকে চির নিদ্রার ঘুম পাড়াইয়া দিল। দুঃখের কারণগুলিকে সুখের উপায় মান্য করিলে এই পরিণতি হইয়া থাকে। এই জন্য সংসার রূপী দুর্গম রাস্তাতে চলিবার জন্য বিবেক চাই। বিবেকহীন ব্যক্তি পদে পদে ধাক্কা খায়। মহর্ষি বশিষ্ঠ অতি সুন্দর কহিয়াছেন -

'সংসার দীর্ঘ রোগস্য সুবিচারো মহৌষধম্।
কো ঽহং কস্য চ সংসারো বিবেকেন বিলীয়তে।।'

অর্থাৎ এই সংসারের রোগ খুব ভয়ংকর। ইহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ঔষধ হইতেছে সুবিচার। সুবিচার কী? জিজ্ঞাসা হয় - আমি কে? এই সংসার কী? সংসারের রচয়িতা কে? ইহাকে বিবেকের দ্বারা জ্ঞান করা দরকার। বিবেকী হইয়া ইহার জ্ঞান কর। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন - 'সদসদ্ বিবেকী'। অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ তত্ত্বের জ্ঞান পৃথক এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাঁহাকে

বিবেকী বলা হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঘোষণা -

'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।।'

অর্থাৎ যখন মনুষ্য এই বিস্তৃত আকাশকে চর্মের দ্বারা বেষ্টিত করিতে পারিবে, তখন আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান না প্রাপ্ত করিয়াও দুঃখের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে। যেরূপ আকাশকে চাটাইয়ের দ্বারা আবৃত করা অসম্ভব, ঐ রূপেই পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত না করিয়া সকল দুঃখকে সমাপ্ত করা অসম্ভব। ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, যদি আমরা জন্ম মরণের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে হইবে। পরমাত্মাকে জানিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় - **যোগাভ্যাস,** যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক উচ্চ চেতনা প্রাপ্ত করিয়া থাকে। **'ঋতম্ভরা'** প্রজ্ঞার প্রাপ্তি করিয়া থাকে। নারদ ভক্তি সূত্রের মধ্যে খুব সুন্দর বিশ্লেষণাত্মক শ্লোক পাঠ করিয়া পাইয়াছি -
'যং লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি, যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি।'

অর্থাৎ পরমাত্মা কে প্রাপ্ত করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে, অমর হইয়া যায়, তৃপ্ত হইয়া যায়, ইচ্ছার (কামনার) সমাপ্তি হইয়া যায়, নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, চিন্তা করে না, দ্বেষ হীন হয়, পক্ষপাত রহিত হয় বা অনুরক্ত হয় না, পার্থিব উৎসাহের সমাপ্তি ঘটে। তাঁহাকে জ্ঞান করিয়া মনুষ্য আত্মারাম এবং প্রভুমত্ত হইয়া যায়। মানব হইতেছে এই সৃষ্টির সর্বোত্তম প্রাণী, এই জন্য মনুষ্য সর্বোত্তম কর্মের দ্বারা সর্বোত্তম লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করিতে পারে। মুক্তির অপেক্ষা অন্য কোন

সর্বোত্তম লক্ষ্য এই সংসারে হইতে পারে না। কোন সংস্কৃত কবি ঠিকই বলিয়াছেন -

'ন তদস্তি জগৎকোশে শুভকর্মানুপাতিনা।
যৎপৌরুষেণ শুদ্ধেন সমাসাদ্যতে জনৈঃ।।'

অর্থাৎ সংসাররূপী ভাণ্ডারে কোন এমন বস্তু নাই যাহা মনুষ্যগণের দ্বারা শুদ্ধ পুরুষার্থের সহিত কৃত শুভকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন - **'নিবাসন্তি পরাক্রমাশ্রয়ো ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ।'** অর্থাৎ সকল সমৃদ্ধি সফলতা পরাক্রমের উপর আশ্রিত রহিয়াছে তথা তাহা নিরাশার সহিত অবস্থান করে না। আসুন, আমরা অমৃতের পুত্র। হওয়ায় নিজ জন্ম-জন্মান্তরের শুভ সংস্কার সকলকে জাগৃত করিয়া পরাক্রমের সহিত আশাবাদী হইয়া নিজ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি গমন করি, উৎকণ্ঠা পূর্বক লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য ঘোর পুরুষার্থ করিতে পারিলে নিশ্চিত কোন না কোন দিন লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিব। উপনিষদের বাণী -

'প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরোবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।।'

অর্থাৎ প্রণব ধনুক, তির আত্মা, আর ব্রহ্ম হইল লক্ষ্য। প্রমাদ, আলস্য রহিত হইয়া ঐ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করা উচিত। এই সংসার একটি পরীক্ষা ভবন (Examination Centre)। আমরা সকলে পরীক্ষার্থী। ঈশ্বর পরীক্ষক। প্রশ্নপত্র বিতরণ হইয়া গিয়াছে। তিন ঘন্টা সময় দেওয়া হইয়াছে। বাল্যকাল সমাপ্ত হইলে এক ঘন্টা পূর্ণ হইবে। যৌবন সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয় ঘন্টা পূর্ণ হইবে তারপর তৃতীয় ঘন্টা মৃত্যুর ঘন্টা অর্থাৎ পরীক্ষার সমাপ্তি ঘন্টা বাজিয়া উঠিবে। মৃত্যুর ঘন্টা বাজার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সংসার রূপী বিশাল ভবনে কর্মরূপী প্রশ্নের উত্তর

যোগের মধ্যে বাধক হইতেছে সকল এষণা

মনের বৃত্তি সকলকে আমরা তিনভাগে ভাগ করি - পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। যদি আমরা সিগমেন্ড ফ্রায়ড তথা এডলর - ভাষাতে 'সেক্স' তথা 'ঈগো' অর্থাৎ 'কাম' তথা 'অহংকার' বা অস্মিতা বলি, তাহা হইলে বাস্তবিক সমস্যা হইতেছে 'বাসনা'র। বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষীণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য অস্থিরতার মধ্যে, চঞ্চলতার মধ্যে থাকে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বাসনাকে ক্ষয়ের রাস্তা বলিয়াছেন। যেহেতু বাসনা উপভোগ করা হয়, বাসনাকে তৃপ্ত করা কঠিন হয়। তাই বাসনাকে ভোগ করিলে সে নিজ হইতেই ক্ষীণ হইয়া যাইবে, শেষ হইয়া যাইবে। পরন্তু ভারতীয় ঋষিমনীষিগণের বক্তব্য এই যে - বিষয় সকলকে ভোগ করিলে, ভোগকে উপভোগ করা হয় বটে, পরন্তু তাহার ভোগ করিবার লালসা পুনরায় জাগরিত হইয়া থাকে। এই চক্রটিতো কখনো শেষ হইয়া যায় না। 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা'র বর্ণাশ্রম বিষয়ের সন্ন্যাস আশ্রম প্রকরণের মধ্যে সকল এষনা তথা বাসনাগুলিকে শান্ত করিবার জন্য মহর্ষি অতি উত্তম সিদ্ধান্ত দিয়াছেন -

"অস্যৈকা লোকৈষণা ভবতি তস্যোভে পূর্বে পুত্রৈষণাবিত্তৈষণে ভবতঃ। যস্য চেশ্বরৈষণাস্তি তস্য তাস্তিস্রো নিবর্ত্তন্তে।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তির যশ বা খ্যাতির এষণা ইচ্ছা রহিয়াছে তাহার পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছাও থাকিবে, তাহার ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছাও হইবে। যাহার পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা হইয়াছে তাহার পুত্র এবং মানমর্যাদারও ইচ্ছা আসিবে পরন্তু যাহার ঈশ্বরের প্রতি এষণা জন্মাইবে তাহার এই তিনটি এষণা উৎপন্ন হইবে না। তাহার এই তিনটি এষণা শান্ত হইয়া যায়। কাঁটা ঝোপঝাড় পূর্ণ মাঠে খালি পায়ে হাঁটা যায় না। সেখানে হাঁটিতে হইলে

হয়তো সম্পূর্ণ মাঠটিকে চামড়ার দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে নতুবা নিজ পদ যুগল কে চামড়ার জুতোর আচ্ছাদন দিতে হইবে। সম্পূর্ণ মাঠকে চামড়া দ্বারা আবৃত করা অসম্ভব কার্য, অতএব পদ দ্বয়কে জুতার আবরণ দেওয়া উপযুক্ত হইবে। এইভাবে বাসনা পূর্ণ সংসারে অসংখ্য কামনা-বাসনার পীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে হয়তো সকল বাসনার প্রাপ্তি হওয়া উচিত নতুবা সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করা উচিত। পরন্তু বাসনা সকলের পূর্তি হওয়া কখনো সম্ভব নয়। কেননা একটি বাসনা পূরণ করিতে গেলে অপর বাসনা আসিয়া হাজির হয়। এই জন্য জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, সন্তোষের দ্বারা বাসনা সকলের ত্যাগ করাই শ্রেয় পন্থা।

আমরা সকলে জানি যে বাহিরে বিষয়ের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাই মনের মধ্যেও বাসনার ভাণ্ডার বাসা বাঁধিবে। ইহ জন্মে তো পূর্ব জন্মেরও সকল বাসনার সংস্কারের জাল ঐ ভাবেই জড়িত রহিয়াছে, যেরূপ নারিকেল গাছের বল্কল। আমরা যে কেহ দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি তাহার সংস্কার আমাদের চিত্ত পটলে আকৃত হইয়া থাকিয়া যায় এবং সেই সংস্কার যখন পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত করে তখন বাসনার রূপ ধারণ করে। মনকে বাসনা মুক্ত করিতে হইলে কী করিতে হইবে? বলা যাইতে পারে যেরূপ জলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিম্নগামী, ঠিক ঐরূপে বাসনাময় মনেরও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়সকলের দিকে নিম্নগামী হইয়া থাকে। যেরূপে জলকে যন্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বগামী করা যাইতে পারে ঠিক ঐ রূপে মনকেও মন্ত্রের দ্বারা উর্ধ্বগামী করিতে পারা যায়, বাসনামুক্ত করিতে পারা যায়। মহর্ষি 'তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্'। যোগ সূত্রে ইহার নিরূপণ করিয়াছেন। তথা 'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।' (যোগ০

২/১) এর মধ্যে ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্বাধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া মহির্ষ ব্যাসজী লিখিয়াছেন - **'স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদি পবিত্রাণাং জপো মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা'** অর্থাৎ প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষশাস্ত্র সকলের অধ্যয়নকেই স্বাধ্যায় বলা হইয়া থাকে। মনকে উচ্চে উত্তীর্ণ করিতে অথবা মনকে সুসংস্কারিত করিবার জন্য প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তথা গায়ত্রী মন্ত্রাদির জপ যখন অনিবার্য করা হইবে, তখনই মন বাসনাদি হইতে মুক্ত হইতে পারে। **'চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম শুভাশুভম্। প্রসন্নাত্মনি স্থিত্বা সুখমব্যয়মশ্নুতে।।'** মৈত্র্যং ৬/২০ অর্থাৎ চিত্ত বাসনা রহিত নির্মল এবং বৃত্তি রহিত হইয়া গেলে মনুষ্য পুণ্যপাপ কর্মকলাপকে সমাপ্ত করিয়া দেয়। সেই মনুষ্য যথেষ্ট প্রসন্নাত্মা হইয়া পরমাত্মার মধ্যে স্থির থাকিয়া অত্যন্ত পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্যাস ভাষ্যে কথিত হইয়াছে -

"জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজ ভাবঃ পূর্ব সংস্কারো ন প্রত্যয় প্রসূর্ভবতি।" অশুভ সংস্কারগুলিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ব্যক্তি জ্বালাইয়া দিবার পর পুনরায় সেগুলি আগত হয় না। যেরূপ ঘাসকে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলে ছাই হইয়া যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় না। সংস্কারকে জ্বালাইবার জন্যও এই পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়। ভানু হইতেছে প্রকাশের উৎস এবং প্রকাশ হইতেছে জ্ঞানের প্রতীক। ঋষিগণ বিদ্বানগণ সর্বদা জ্ঞানের মহিমা গান করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন -

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।" - (গীতা)।

পাপী এবং মহাপাপীরাও জ্ঞানের নৌকার পাড়ি দিয়া পাপের জলোচ্ছাস, বন্যাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। কেননা জ্ঞানের

যখন ভিতরে নাই তখন বাহিরের শত্রু কিভাবে থাকিতে পারে। এই জন্য যমরূপী শক্তিশালী স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনার উচ্চ শিখর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারা যায়। মনুমহারাজ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে - সকল যমের সহিত সকল নিয়মেরও সেবন করা (পালন করা) অনিবার্য।

'শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।' (যোগ. ২/৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়মের অন্তর্গত মান্য করা হইয়াছে। নিয়মকে আজপর্যন্ত বাহিরের সাধনা গণ্য করা হইয়াছে পুনরপি ঈশ্বর প্রণিধান নামক বিশেষ সাধনের চর্চা যাহা কিনা-মোক্ষ প্রাপ্তির অনিবার্য সাধন হইবার হেতুসকল নিয়মেরও মহত্ত্ব, যম সকলের হইতে কোন অংশে কম করা যাইতেছে না। একজন ব্যক্তি সিড়ি দিয়া ভবনের শীর্ষ তল পর্যন্ত পৌঁছাইতে ছিল, অকস্মাৎ এমন সময় পা পিছলাইয়া নিম্নে পতিত হইল। ঐ ব্যক্তির ভয়ংকর আঘাত লাগিল। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে - ভাই! আপনি তো ইমারতের উপর তলাতে পৌঁছাইয়া গিয়াছিলেন শুধু সামান্য বাকি ছিল। আপনি নিচে কেন পড়িয়া গেলেন? ঐ ব্যক্তি খুব সুন্দর উত্তর দিল। সে বলিল আপনারা যে উত্তর শুনিতে চাহিছেন তাহা বলিব। এই ইমারতের উচ্চতা তো রহিয়াছে কিন্তু যে সিড়ির সাহায্যে ইমারতের উপরে উঠিতে হয়, সেই সিড়ির উপযুক্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নাই। বাস্তবে ভবনের নির্মাণ কেবল উচ্চতা হইলেই হইল না কিন্তু উচ্চতায় আরোহণের জন্য উপযুক্ত সাধনের অর্থাৎ সিড়িটির যথার্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ হওয়া আবশ্যক ছিল। যোগ মার্গের প্রবক্তা মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের অন্তিম সিড়ির জন্য বিবেক এবং বৈরাগ্যের কথন করিয়াছেন। বিবেক অর্থাৎ- সৎ এবং অসতের

বিচার। বৈরাগ্য অর্থাৎ সাংসারিক বস্তু সকলের প্রতি (বিরক্তি) অনুরাগ-উদাসীনতা ইহা একইভাবে প্রাপ্ত হয় না। ইহার জন্য নিত্য প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাসের দ্বারা মনের মধ্যে অসাধারণ শক্তি উৎপন্ন হয়। তখন ইন্দ্রিয় সংযম করিতে, কাম-ক্রোধ ইত্যাদিকে বশে রাখিবার জন্য কষ্ট করিতে হয় না। যেরূপ কচ্ছপ একবার তাহার হাত পা খুলির মধ্যে সংকুচিত করিয়া লইবার পরক্ষণে আর তাহাদের বাহির করে না, হাতিয়ার দ্বারা খন্ডখন্ড করিলেও বাহির করে না। একটি শ্লোকে কবি খুব সুন্দর লিখিয়াছেন -

'বিষয়াসক্তচিত্তানাং গুণঃ কো বা ন নশ্যতি।
ন বৈদুষ্যং ন মানুষ্যং নাভিজাত্যং ন সত্যবাক্।'

অর্থাৎ **বিষয়াসক্ত মনুষ্যের সকল গুণ নষ্ট হইয়া যায়।** তাহার মধ্যে চিন্তা ভাবনা থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না, স্বাভিমান থাকে না এবং সত্যবচন থাকে না। এই জন্য যোগ মার্গের পথিকদের জন্য সর্বথা বিষয় বাসনা ত্যাগ করা উচিত। প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি কাম ভোগেও সুখ রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবার কথা কেন বলা হইতেছে? ইহার উত্তর খুবই সহজ। কাম ভোগকে ত্যাগ করিতে সেই স্তরে বলা হইতেছে, যখন তাহার সম্মুখে বৃহৎ (বিরাট) সুখের পরশ পরিলক্ষিত হয়। বিরাট সুখ হইতেছে যাহা বর্তমানেও সুখের এবং পরিণামেও সুখের হইতে পারে। কাম ভোগ বর্তমানে সুখের হইতে পারে কিন্তু পরিণামে সুখদ হয় না। সেই বিরাট্ সুখের প্রাপ্তির জন্য অবরোধক ও বাধক রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির মধ্যে বিরাট্ সুখ প্রাপ্ত করিবার ভাবনা জাগ্রত হইয়াছে, তাহার নিকট কাম ভোগের ন্যায় সুখটি কেবল বিড়ম্বনার ন্যায় হইয়া থাকে।

খেলনা মোটর গাড়ি শিশুদিগের জন্য আকর্ষক হইতে পারে। কিন্তু যাত্রা করিবার ইচ্ছুক আরোহীগণকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। যাহার সম্মুখে বিশাল এবং বিরাটের পরিকল্পনা রহিয়াছে সে খেলনা কে মহত্ত্ব দিতে পারে না। অস্তু –

সাধকের জন্য **ঈশ্বর প্রণিধান**-এর বিশেষ মহত্ত্ব রহিয়াছে। **ঈশ্বর প্রণিধান** – ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে তথা নিজ ক্রিয়াকলাপ সকলের সমর্পণ করা অর্থাৎ যাহা কিছু করা তাঁহার আজ্ঞা পালন নিমিত্ত এবং তাঁহার প্রাপ্তির জন্য জানিয়া করা, সাংসারিক স্বার্থ সকলকে তুচ্ছ জানিয়া লওয়া। ব্যাসভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে -

‘শয্যা ऽऽসনস্থো ऽথ পথিব্রজন্ বা, স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্ক জালঃ।

সংসারবীজক্ষয়ং ঈক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যুক্তো ऽমৃত ভোগ ভাগী।”

অর্থাৎ শয্যার উপর হোক, বা আসনের উপর উপবিষ্ট হোক অথবা মার্গে চলমান হোক, যিনি সূক্ষ্ম সংশয়গ্রন্থির রহিত হইয়া সংসারের বীজ বাসনা বা রাগদ্বেষ মোহ ক্ষীণ করিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত রাখিয়াছেন, সেই নিত্য যোগী অমৃত ভোগের ভাগীদার হইতে পারিবেন। অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত **যম** এবং **নিয়ম** কে **ব্রতাভ্যাস** বলা যাইতে পারে। কেননা ব্রতাভ্যাসের দ্বারাই তো ক্রিয়াভ্যাসে অর্থাৎ **আসন** হইতে **সমাধি** পর্যন্ত সফলতা মিলিতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রাণায়ামের চর্চা আরম্ভ করিবার পূর্বে আসনের চর্চা করিয়াছেন। কেননা **আসন** ব্যতীত প্রাণায়ামে সফল হওয়া সম্ভব নয়। শরীরের স্থির হওয়া, নিশ্চল হওয়া, সুখ পূর্বক উপবিষ্ট হওয়া, ইহাই **আসন**। **প্রাণায়াম** প্রাণ বিশিষ্ট প্রাণীদিগের জন্যই তো হইয়া

থাকে। প্রাণায়ামের মহত্ত্বের সম্বন্ধে বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে -

'নমস্তে অস্ত্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ নিষ্ঠতে আসীনায়োত তে নমঃ।।" (অথর্ব০ - ১১/৬/৫)

অর্থাৎ হে প্রাণ! অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তোমাকে নমন করিতেছি স্বাগত হোক। বাহিরে নিষ্ক্রমণের জন্যও তোমার স্বাগত হোক। অভ্যন্তরে স্থির হইবার জন্য তোমার স্বাগত হোক অপিচ বাহিরে স্থির হইবার জন্য স্বাগত হোক। শ্বাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া যাওয়া এবং প্রশ্বাসকে বাহিরে নিষ্ক্রমণ করিয়া স্থির হইয়া যাওয়া, এই দুই প্রকারের প্রাণায়ামের চর্চা এই মন্ত্রে করা হইয়াছে। যেরূপ শ্বাসগ্রহণ এবং বহিষ্ক্রমণ স্বাগত করিবার যোগ্য, স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। সেইরূপ শ্বাসগ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরে রোধ করিয়া দেওয়া তথা বাহিরে নিষ্কাসন করিয়া বাহিরে রোধ করিয়া দেওয়াও স্বাগত যোগ্য, স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর, ইহার জ্ঞান হওয়া উচিত। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণযন্ত্রের বিশ্রাম হইয়া থাকে তথা তাহার শোধন হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাণায়ামের সাহায্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দোষ নিবারণ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের সংজ্ঞা মহর্ষির ভাষায় -

'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।' (যোগদর্শন ২/৪৪)

আসন সিদ্ধস্থ হইবার পর, শ্বাসের দ্বারা ভিতরে প্রবেশকারী বায়ু এবং প্রশ্বাসের দ্বারা বাহিরে নির্গমনকারী বায়ুর গতিকে থামাইয়া রাখিলে প্রাণায়াম হয়। উপনিষদে প্রাণ বিদ্যার মহত্ত্বের উপর আলোক পাত করা হইয়াছে - **'স যথা শকুনি ঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনং অলব্ধ্বা প্রাণমেবোপাশ্রয়তে প্রাণ বন্ধনং হি সৌম্য মনঃ।'**

যেরূপ সূতায় বাঁধা পক্ষী বিভিন্ন দিকে উড়িয়াও সূতার আকর্ষণে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসে সেই প্রকারে মনরূপী পক্ষী প্রাণের ডোরে আবদ্ধ হইয়া এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া প্রাণেরই আশ্রয় লইয়া থাকে। হে সৌম্য! মন প্রাণের বন্ধনে অবস্থান করিয়া থাকে। **ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাণায়াম মনকে থামাইবার একটি উৎকৃষ্ট সাধন।**

প্রত্যাহারের সম্বন্ধে বেদ মন্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে —

'বি মে কর্ণা পতয়তো বিচক্ষুবীর্দ জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতিদূরআধীঃ কিংস্বিদ্‌বক্ষ্যামি কিমুনু মনিষ্যে।।'
(ঋগ্বেদ ৬/৪/৬)

অর্থাৎ আমার **কর্ণ** তাহার নিজ শব্দ ব্যসন হইতে বিগত হইয়া গিয়াছে, পৃথক হইয়া গিয়াছে, অতিষ্ট হইয়াছে, ইহা শব্দ ব্যসন ছাড়িয়া দিয়াছে। **নেত্র** তাহার স্বভাব রূপ ব্যসন হইতে পৃথক হইয়াছে। সে রূপ ব্যসনকে ত্যাগ করিয়াছে। **অহং** জ্যোতি ইহা তো হৃদয়ে অবস্থিত সে তাহার অহং মম ভাব হইতে বিগত, রহিত, পৃথক হইয়া গিয়াছে, সে অহংকার মমকার করা পরিত্যাগ করিয়াছে। সুদূরে চিন্তনকারী **মন** তাহার নিজ সংকল্প বিকল্প রূপ প্রপঞ্চ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, ইহা সঙ্কল্প বিকল্প প্রপঞ্চকে নিস্পন্ন করিয়াছে। আমি এই স্থিতি কে কী আখ্যা দিব আর কী মান্য করিব? এই বেদন্ উচ্চ স্তরীয় প্রত্যাহার ব্যক্ত করিতেছে যে সকল ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ **মন, বুদ্ধি, চিত্ত** এবং **অহংকার** নিজ নিজ ব্যবহার হইতে অপসারিত হোক। 'মনু' স্মৃতি'তে প্রত্যাহারের ফল প্রতিফলিত করিয়াছে - **'প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্'** প্রত্যাহার পালনের দ্বারা সংসর্গ দোষ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। যেরূপ রাণী মৌমাছি যত্র যত্র গমন করে তত্র তত্র অন্যান্য মৌমাছিরাও গমন করে। ইহার তাৎপর্য এই যে মনের সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করাই হইতেছে - প্রত্যাহারের মুখ্য কার্য। যোগ দর্শনে প্রত্যাহারের স্বরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি উদ্ধৃত করিলেন -

'স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।'
যোগ. ২/৫৪

ইন্দ্রিয় সকলের নিজ বিষয় হইতে অপসারণ হইয়া যাইবার পর চিত্ত - স্বরূপের অনুসারে হইয়া যাওয়া অথবা ইন্দ্রিয় শক্তি সকলের মনের মধ্যে বিশ্রাম পাওয়াতেই প্রত্যাহার হয়। যদি আমরা সূক্ষ্মতার সহিত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার রূপী যোগীর বহিরঙ্গভূত সাধন সকলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি; তাহা হইলে স্পষ্ট দ্রষ্টব্য হইবে যে এই পঞ্চ সাধন আমাদিগের অন্তর্যাত্রার জন্য সকল প্রকারে প্রস্তুতি করিয়া সমাধি সোপানের উপর উপবেশন করিতে কৃপা প্রদান করিবে। যেরূপ আমরা বাহিরে কোন স্থানে যাত্রা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হই তখন বাড়ির আত্মীয় স্বজন, মাতা-পিতা, পত্নী, পুত্র ইত্যাদি আমাদিগের শুভ যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করিয়া রেল গাড়িতে বসাইয়া আসেন, ঐরূপ আমাদিগের অন্তর্যাত্রার প্রস্তুতিতে বহিরঙ্গভূত পঞ্চসাধন ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। যোগ দর্শনের তৃতীয় পাদে অবতরণের পরিপ্রেক্ষিতে মহর্ষি ব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন যে - 'উক্তানি-পঞ্চবহিঙ্গানি সাধনানি। ধারণা বক্তব্যা।' পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন ব্যক্ত হইয়াছে। এখন 'ধারণা' এই অঙ্গের পরিচয় প্রদান করা উচিত। 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্যধারণা'। যোগ. ৩/১। অর্থাৎ চিত্তকে দেশ বিশেষ অর্থাৎ নাভি, হৃদয়, মস্তক ইত্যাদির মধ্যে স্থির রাখাতেই 'ধারণা' হয়। যেরূপ কোন পদার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে অবস্থান করিয়া অনুসন্ধান করেন, আবিষ্কার করেন ঐরূপ বিমান চালক আকাশ মার্গে অত্যন্ত সতর্ক জাগ্রত একাগ্রচিত্ত হইয়া বিমান চালনা করেন ঐরূপই যোগীজন লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য মন-মস্তিষ্ক কে একাগ্র

করিয়া ধ্যেয় বস্তুর উপর ধ্যান কেন্দ্রিভূত করেন। ধ্যান আবার ধারণা ব্যতীত সম্ভব নয় এই জন্য ধারণাকে মহর্ষি যোগের অন্তরঙ্গ সাধন মান্য করিয়াছেন। কোন মনীষী অতিসুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন -

'চলং চিত্তং জ্ঞানং স্থিরং চিত্তং ধ্যানম্।'

অর্থাৎ চিত্তের চলন অবস্থাকে বলা হয় জ্ঞান এবং স্থির অবস্থাকে বলা হয় ধ্যান। চলন অবস্থা অনেক সমস্যা উৎপন্ন করে কিন্তু স্থিরতা স্থিতিতে সকল সমস্যা দূরীভূত হইয়া যায়।

আমরা জল দেখিয়াছি তথা বরফও দেখিয়াছি। জল তরল এবং চঞ্চল তাহার মধ্যে যদি মৃত্তিকা ছড়ানো হয় তাহা হইলে শীঘ্রই মিলিত হইয়া বাহিত হইয়া যাইবে। মন হইতেছে চঞ্চল তাই শীঘ্রই বাহিরের ঘটনাকে গ্রহণ করিয়া নেয় তথা উদ্দীপনা উৎপন্ন হয়। তখন যেকোন পরিস্থিতি এবং ঘটনা স্পর্শ করিয়া সামনে রওনা হইয়া যায়, নিজ প্রভাব ত্যাগ করিতে পারে না, এই জন্য ধ্যানের দ্বারা মনকে নির্লেপ প্রদান করা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলির উক্তি - **'তত্র প্রত্যয়ৈক তানতা ধ্যানম্।'** যোগ০ ৩/২

অর্থাৎ ধারণা বিশিষ্ট স্থানে একটি বস্তুর সংলগ্ন থাকিবার জ্ঞানের প্রবাহ বজায় রাখাকেই ধ্যান বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধ্যানের মহিমা গান করা হইয়াছে। কেননা কথিত হয় ধ্যানের বৃক্ষে শান্তির ফল উৎপন্ন হয়। বাস্তবে ধ্যানের দ্বারাই তো ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করা হইয়া থাকে। ধ্যানের দ্বারাই অনীশ্বর্যত্বকে সমাপ্ত করিতে হয়। **ধ্যানেন অনীশ্বরান্ গুণান্।** মহর্ষি কপিলাচার্য ধ্যানের বিষয়ে উপদেশ করেন যে - **'রাগোপহতির্ধ্যানম্।'** সাংখ্য০ ৩/৩০।।

অর্থাৎ রাগের স্তব্ধ হইয়া যাওয়াতেই 'ধ্যান' হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের ধ্যান করিবার সময় অন্য কোন বিষয়ের প্রতি রাগের বিরতি হইলে ধ্যান হয়। "**ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।।**" সাংখ্য৹ ৬/২৫। যোগের বিষয় হইতে ভিন্ন অন্য বিষয়ের মধ্যে মনের না যাওয়াই **ধ্যান** হয়। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি কে আমরা সরল ভাষাতে বুঝিতে পারি একটি উদাহরণ দ্বারা - একজন ধনী ব্যক্তির আভূষণ সরোবরের মধ্যে পতিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি তাহার নিজ প্রিয় মিত্রকে বলিল যে সরোবরে অমুক স্থানে আমার স্বর্ণাভূষণ হারাইয়াছে, আপনি তাহা প্রাপ্ত করিয়া আপনার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন। সেই ব্যক্তি নিজ সত্যবাদী ধনবান মিত্রের শব্দ প্রমাণ কে একশ' শতাংশ সত্য মান্য করিয়া '**শব্দ প্রমাণকা বয়ং যচ্ছব্দমাহ তদস্মাকং প্রমাণম্।**' (মহাভাষ্য৹) অর্থাৎ আমরা শব্দ প্রমাণকে মান্য করি, অতএব যাহা শব্দ প্রমাণ ব্যক্ত করে তাহাকে মান্য করি। ঐ সরোবরে ঐ স্থানে একাগ্র চিত্ত হইয়া বারংবার ডুব দিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কেবল আভূষণই আভূষণ ভাষমান হইতে লাগিল, এই স্থিতিকে আমরা ধ্যান বলিয়া থাকি। এই রূপ সাধক যখন ঈশ্বর রূপী ধ্যেয় বস্তুকে অভিলক্ষিত করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত করিবার জন্য বারংবার জপ, গায়ত্রী মন্ত্রের জপ, বৈদিক ওম্ সন্ধ্যার দ্বারা ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের চিন্তন করিতে থাকে তখন তাহাকে **ধ্যান** বলা হয় এবং সেই ধ্যান যখন ধ্যেয়কারে পরিবর্তিত হইয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরকে যখন সাধক প্রাপ্ত করিয়া থাকে তখন তাহাকে **সমাধি** বলা হয়। অর্থাৎ ধ্যানের মধ্যে তিনটি তত্ত্বের স্মৃতি উপস্থিত থাকে পরন্তু সমাধিতে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুরই বোধ হইয়া থাকে, ধ্যান এবং ধ্যাতা উভয়ই হারাইয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথন হইতেছে —

'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং-স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।' যোগ৹ ৩/৩

অর্থাৎ সেই ধ্যানই যখন ধ্যেয় বস্তু মাত্র প্রতীত হইতেছে এবং নিজ সম্বন্ধে কোন কিছুই কল্পনা হইতেছে না যে, আমি এই বস্তুর ধ্যান করিতেছি, কিন্তু নিজ ধ্যাতার সংকল্পও উপস্থিত হয় না, সেই ধ্যোয় বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়াই **সমাধি**। এই সমাধিকে **অসমপ্রজ্ঞাত সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি** তথা **নির্বীজ সমাধি** ও বলা হয়। অনাদি কাল হইতে জীবাত্মা এই সমাধি দ্বারা নিত্যানন্দ প্রাপ্ত করিবার অভিলাষ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতি এবং পুরুষজন্য অবিদ্যার কারণে বারংবার তাহাদেরকে জন্ম মরণের চক্রে আসিতে থাকে। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য কর্মের প্রভাবের দ্বারা যখন বিবেকের উৎপত্তি হইয়া থাকে তখন সেই পুণ্যবান জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যু চক্র হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অস্তু -

উপসংহার

একটি ছোট শিশু মায়ের হাত ধরিয়া মেলাতে ভ্রমণ করিতে গেল। মা তাহাকে অনেক মিষ্টি, খেলনা ক্রয় করিয়া দিলেন। শিশুটি প্রসন্ন হইয়া মায়ের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল। লোকারণ্যের মধ্যে শিশুর হাত মায়ের হাত হইতে পৃথক হইয়া গেলে, শিশু মেলার মধ্যে সঙ্গীহীন হইয়া স্বজোরে ক্রন্দন করিতে থাকিল। ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে - শিশু তুমি কেন বিলাপ করিতেছে? তোমার হাতে মিষ্টি এবং খেলনাও রহিয়াছে তবুও তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? শিশুটি কহিল - মন্ডা-মিঠাই আমার চাই না। খেলনাও চাই না। আমি কেবল আমার মা'কেই চাই। যোগমার্গের পথিকগণের ক্ষেত্রে সাংসারিক বস্তু সকলের চাহিদা, কামনা সমাপ্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের কেবলমাত্র পরমাত্মা রূপী চাই। সাধক প্রার্থনা করিয়া থাকে যে - "ত্বং হি নঃ পিতাবসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধাতে সুম্নমীমহে।"

যোগমার্গের দিব্য সন্দেশ

প্রকাশক পরিচিতি

১৯৪৮ সালের সুরেন্দ্রনাথ মাজির আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ রাণীচক। প্রতিষ্ঠাতার পরিবার একটি পূর্ণ বৈদিক পরিবার। প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কর্ণধার তাঁর সুপুত্র হিমাংশুশেখর মাজি। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র অর্থাৎ হিমাংশুশেখর মাজি'র সুপুত্র ডাঃ দুলাল সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী (বেদ, দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ) এবং পত্নী লীনা দেবী।

আমি ডাঃ দুলাল সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী সস্ত্রীক স্বর্গীয় পিতামহ এবং স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্ণ বৈদিক পরিবারের ধারাবাহিকতায় এই 'অর্ঘ্য' খানি পাঠকগণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত করিলাম। এবং শাস্ত্রীয় পিতা পূজ্য আচার্যব্রহ্মানন্দ জী'র প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম।

।। ওম্ ।।

আর্য্য সমাজের দশ নিয়ম

১। সব সত্যবিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

২। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, সর্ব্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্য্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারই উপাসনা করিবে।

৩। বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্য্যের পরম ধর্ম।

৫। সব কার্য্য ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্ব্বক করিবে।

৬। সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করিবে।

৭। সকলের সঙ্গে ধর্মানুসারে প্রীতিপূর্ব্বক যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে।

৮। অবিদ্যা নাশ ও বিদ্যা বৃদ্ধি করিবে।

৯। প্রত্যেকে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না, বরং সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি বুঝিবে।

১০। সব মনুষ্য সামাজিক সর্বহিতকর নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকিবে এবং প্রত্যেক হিতকর নিয়মে স্বতন্ত্র থাকিবে।